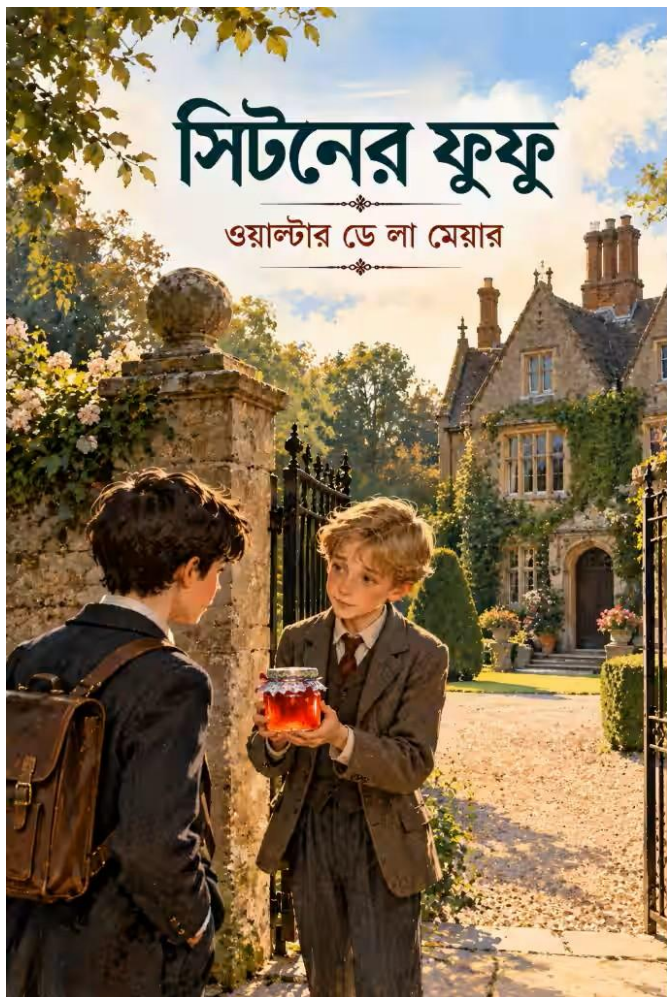


সিটনের ফুফু

ওয়াল্টার ডে লা মেয়ার



সিটনের ফুফু

ওয়াল্টার ডে লা মেয়ার



অনুবাদ • এস হক

প্রচ্ছদ • ক্যাটালগ

সহযোগিতায় • আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স

www.catalog.com.bd
info@catalog.com.bd

কপিরাইট © Catalog.com.bd

ইংরেজি মূল রচনাটি পাবলিক ডোমেইনভুক্ত। এই সংস্করণের বাংলা অনুবাদ, সম্পাদনা ও বিন্যাস Catalog.com.bd –এর স্বতন্ত্র সৃজনশীল কাজ। Catalog.com.bd –এর অনুমতি ব্যতীত এই বাংলা অনুবাদ বা এর বিন্যাসকৃত সংস্করণের অনুলিপি পুনঃপ্রকাশ বা বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত নয়।

সিটনের ফুফুর কথা আমি তাকে দেখার অনেক
আগেই শুনেছিলাম। স্কুলে সিটনের হাতে অন্য
ছেলেদের তুলনায় বেশ টাকা থাকত, আর সে
প্রায়ই অদ্ভুত বিদেশি খাবার নিয়ে আসত।
চেহারায হলদেটে, রোগা ও দুর্বল বলে ছেলেরা
তাকে পছন্দ করত না; আমরা তাকে ‘পঙ্গো’
বলে ডাকতাম।

আমার সঙ্গে তার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল না, তবু
একদিন সে আমাকে এক বয়াম অদ্ভুত রঙের
জেলি উপহার দিলে কৃতজ্ঞতায় প্রতিশ্রুতি
দিয়েছিলাম, ছুটিতে তার ফুফুর বাড়ি যাব।

প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গিয়েছিলাম, কিন্তু ছুটি
আসার আগে সিটন এসে জানাল, তার ফুফু
আমার আসার অপেক্ষায় আছেন—আর তিনি
নাকি আমার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করবেন।

কথাটির ভেতরে এমন এক অদ্ভুত জোর ছিল যে
আমার কৌতূহলও হলো, অস্বস্তিও লাগল।

অনেক পথ পেরিয়ে আমরা পৌঁছালাম তাদের
পুরোনো বাড়িতে। বাড়িটি উঁচু, জানালাগুলো
ভারী পর্দায় ঢাকা, আর চারপাশে বিশাল গাছ ও
বিস্তৃত বাগান। দুপুরে খেতে যাওয়ার সময় দেখি,

ওপরতলার জানালায় এক খাটো অথচ ভয়
ধরানো নারী দাঁড়িয়ে আছেন। কালো পোশাকে
রূপালি নকশা, মাথায় অস্বাভাবিকভাবে জড়ানো
চুল, আর ভারী পাতার আড়ালে আধঢাকা চোখ।
তিনি আমাকে ভুল নামে ডাকলেন, সংশোধন
করলেও তাতে বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না।

খাবার টেবিলে তিনি আমাকে অটেল খাবার
দিলেন, অথচ সিটনকে প্রায় উপেক্ষা করলেন।
কখনো ছেলেটির পড়াশোনা নিয়ে ব্যঙ্গ করলেন,
কখনো তার অপরিচ্ছন্নতা নিয়ে এমনভাবে মন্তব্য
করলেন যেন তার প্রতিটি দুর্বলতা তাঁর কাছে
আনন্দের বিষয়।

পরে ফুফু আমাকে সিটনের ঘর দেখাতে নিয়ে
গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, স্কুলে ছেলেরা তাকে
কেন পছন্দ করে না। প্রশ্নটি করতে করতে তিনি
এমনভাবে তাকিয়ে রইলেন, যেন আমার মুখের
আড়ালে লুকোনো প্রতিটি ভাবনা পড়ে ফেলতে
পারেন।

তারপর নিজেই বললেন, উত্তর দিতে হবে না—
তিনি কাউকে জোর করে কথা বলান না। অথচ
তাঁর কথার ভঙ্গি ও চোখের দৃষ্টি আমার মনে

হলো, তিনি চাইলে সবকিছুই আদায় করে নিতে
পারেন। তিনি আমাকে বাগানে যেতে বললেন;
সিটন তখন ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ছিল।
কিছুক্ষণ পর ফুফুকে দূর থেকে বাগানের পাশ
দিয়ে যেতে দেখলাম।

তিনি আমাদের দিকে তাকালেন না, কিন্তু সিটন
ভয়ে একেবারে কঁকড়ে গেল।

আমি জিজ্ঞেস করতেই সিটন ফিসফিস করে
বলল, তার ফুফু সবকিছু দেখেন—যা চোখে
দেখেন না, তা-ও জেনে যান। তার ধারণা, ওই
নারী শয়তানের সঙ্গে যোগসাজশ করেছেন।

সিটনের বাবা-মা বহু আগেই মারা গেছেন; আর
ওই নারী আসলে তার মায়ের বোনও নন।

সিটন বলল, দাদির দ্বিতীয় বিয়ের কারণে
সম্পর্কটি জটিল, কিন্তু উত্তরাধিকারসূত্রে
সম্পত্তির বড় অংশ তার পাওয়ার কথা। সাবালক
হলেই সে নিজের প্রাপ্য আদায় করবে।

কথাগুলো বলার সময় তার চোখে ক্ষোভ ছিল,
কিন্তু বাড়ির দিকে তাকালেই সেই ক্ষোভ ভয়ে
বদলে যাচ্ছিল।

সন্ধ্যায় ফুফুর সঙ্গে দাবা খেললাম। তিনি আমাকে ধীরে ধীরে এমনভাবে কোণঠাসা করলেন যে আমার রাজা পালানোর পথ পেল না; কিন্তু শেষ আঘাতটি না করে খেলাটিকে ‘ড্র’ ঘোষণা করলেন।

তারপর গুটিগুলো বাক্সে এলোমেলো করে ঢেলে দিয়ে বললেন, তাঁর স্মৃতি নাকি ভালো নয়, তাই ফলাফল আর জানা যাবে না।

সিটন পরে আমাকে জিজ্ঞেস করল, প্রতিপক্ষের হাতে নিজের প্রতিটি চালের ওপর এমন নজরদারি থাকলে কেমন লাগত।

সে বলল, দাবায় আমি তাঁকে হারতে দিইনি— তিনি নিজেই খেলাটির ফল নিজের মতো করে ঠিক করেছেন।

সেই রাতে বাড়ির পরিবেশে এমন এক অদৃশ্য চাপ টের পেলাম, যার ব্যাখ্যা দিতে পারিনি।

বছ বছর পরে লন্ডনের এক দোকানের সামনে সিটনের সঙ্গে আবার দেখা হলো। সে আগের চেয়ে কিছুটা বড় হয়েছে, কিন্তু তার চেহারায়ে সেই পুরোনো ভীতসন্ত্রস্ত ভাব রয়ে গেছে।

সে জানাল, তার বিয়ে হতে যাচ্ছে—মেয়েটির
নাম অ্যালিস। তবু ফুফু বিয়েতে খুশি কি না, তা
নিয়ে সে নিশ্চিত নয়।

আমাকে বাড়িতে এসে অ্যালিসের সঙ্গে দেখা
করতে এবং ফুফুর ব্যাপারে নিজের মতামত
জানাতে অনুরোধ করল। প্রথমে অনীহা
দেখালেও শেষ পর্যন্ত তার আমন্ত্রণ গ্রহণ
করলাম।

সিটনের বাড়িতে গিয়ে অ্যালিসকে দেখলাম—
শান্ত, গম্ভীর, সাদা পোশাকে এক তরুণী।

তার মধ্যে আত্মমর্যাদা ও দৃঢ়তার আভাস ছিল,
কিন্তু বাড়ির ওপর ছায়ার মতো বিস্তৃত ফুফুর
প্রভাব যেন তাকেও ঘিরে রেখেছে।

ফুফু আগের মতোই কথা বললেন—কখনো
হাস্যরসের ভঙ্গিতে, কখনো ব্যঙ্গ করে, কখনো
অদ্ভুত সব আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ টেনে।

তিনি বিয়ের কথা বলেও সিটনকে খোঁচা
দিচ্ছিলেন; আর ছেলেটি কখনো নীরব, কখনো
অস্থির হয়ে উঠছিল। অ্যা

লিসের সঙ্গে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা
শুনতে শুনতে আমার মনে হচ্ছিল, তারা দুজনেই
যেন এমন এক শক্তির বিরুদ্ধে পরিকল্পনা
করছে, যার কাছে ভালোবাসা, যৌবন কিংবা
স্বাধীন ইচ্ছার কোনো মূল্য নেই।

সন্ধ্যার পর আমি তাদের বাগানে হাঁটতে গেলাম।
অ্যালিস ও সিটন পাশাপাশি হাঁটছিল, কিন্তু
তাদের আনন্দের মধ্যেও একটা চাপা অস্বস্তি
ছিল।

বিদায়ের সময় সিটনকে বললাম, বিয়ের আগে
যদি শহরে আসতে চায়, আমাদের বাড়িতে
থাকতে পারে। সে কৃতজ্ঞতা জানাল। তারপর
আমি নিজের কাজে ফিরে গেলাম; তাদের কথা
আর বিশেষ ভাবিনি।

শরতের এক দিনে হঠাৎ মনে পড়ল, সিটনের
বিয়ে হয়ে যাওয়ার কথা, অথচ আমি কোনো
শুভেচ্ছা পাঠাইনি। তাই তার গ্রামে গেলাম।

বাড়ির কাছে পৌঁছে অদ্ভুত দ্বিধা হলো; তবু শেষে
দরজায় গিয়ে সিটনের ঠিকানা চাইলাম।

বাড়ির লোকেরা জানাল, অ্যালিস—এখন মিসেস সিটন হওয়ার কথা—ইয়র্কশায়ারে গেছেন। কিন্তু কোথায় সিটন, সে প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর পেলাম না।

ফুফুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার পথে এক কসাইয়ের দোকানে ঢুকে আবার সিটনের খোঁজ করলাম।

দোকানের লোকটি অবাক হয়ে বলল, ‘তরুণ মিস্টার সিটন তো মারা গেছেন—তিন মাসেরও বেশি হলো। বিয়ের ঠিক আগেই।’

আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

সিটনের বিয়ে, অ্যালিসের সঙ্গে তার ভবিষ্যৎ, আর ফুফুর বাড়িতে দেখা সেই সন্ধ্যা—সবকিছু যেন এক মুহূর্তে অথহীন ও ভয়ংকর হয়ে উঠল।

মনে পড়ল, ফুফু কীভাবে সিটনের ওপর নজর রাখতেন, কীভাবে তাঁর উপস্থিতি ছেলেটির সাহস ভেঙে দিত, আর কীভাবে তিনি সবকিছুর ওপর নিজের অদৃশ্য কর্তৃত্ব বজায় রাখতেন।

সিটন কি সত্যিই তাঁর ভয়ে ভেঙে পড়েছিল, নাকি ফুফুর ক্ষমতার মধ্যে এমন কিছু ছিল যা সাধারণ

বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা করা যায় না—আমি বলতে পারিনি।

অন্ধকার হয়ে আসা পথের দিকে তাকিয়ে মনে হলো, তাঁর প্রভাব হয়তো মৃত্যুর পরও সিটনকে ছেড়ে যায়নি।

